চটকল শিল্পে যুক্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মহিলা শ্রমিকদের জীবন ও সংগ্রাম : ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল (১৯০০-১৯৪৭)

শত্রুঘ্ন কাহার*

'চটকলের সম্পর্কে কথা না বলে কলকাতা সম্পর্কে কিছু লেখা সম্ভব নয়' বিংশ শতকে প্রথম দশকে জনৈক পথপ্রদর্শকের (Guide) এ কথা খুব একটা অত্যুক্তি নয়।[১] বস্তুত বাংলার শিল্পায়ন ঘটে এই চটকলকে কেন্দ্র করে। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে হুগলী নদীর উভয় তীরে দ্রুত এই শিল্পের প্রসার ঘটে। এবং এই শিল্পকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে এক নতুন শ্রেণী 'শ্রমিক শ্রেণী'। ১৯০৬ খ্রি: সরকারি অফিসার বি. ফলির বিবরণ থেকে জানা যায়, ২০ বছর পূর্বে চটকলের বেশিরভাগ শ্রমিকই ছিল স্থানীয় বাঙালিরা। কিন্তু কালক্রমে এদের স্থান পূরন করে বিহার, উত্তরপ্রদেশের অবাঙালি শ্রমিকেরা।[২] প্রধানত শ্রমিক চাহিদা, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি এবং তাদের আর্থিক অভাবই তাদের কলকাতামুখী করে তোলে। এর সঙ্গে এক নতুন জীবনের স্বপ্ন অবশ্য তাদের হাতছানি দিয়েছিল। এই নতুন জীবনের হাতছানিতে শুধু পুরুষরাই সারা দিয়েছিল তা কিন্তু নয়, এক বিপুল সংখ্যক মেয়ে শ্রমিকও এর অংশ হয়েছিল। এস. আর. দেশপাণ্ডে তাঁর রিপোর্টে পুরুষ ও মহিলা জুট শ্রমিকের সংখ্যা ওপর যে তথ্য দিয়েছেন তাঁর অনুপাত বার করলে তা দাঁড়ায় ৫:১ এ।[৩] এদের আগমন বাংলার সমাজ, সংস্কৃতি তথা অর্থনীতিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে যা ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

তবে একথা ঠিক এ যাবৎ যে সমস্ত ঐতিহাসিক গবেষণা হয়েছে তাতে মূলত 'সামগ্রিক শ্রমিক শ্রেণীই আলোচিত হয়েছে যার প্রাণ কেন্দ্রে থেকেছে এই পুরুষ শ্রমিক। শুধু বাংলা কিংবা ভারতের ক্ষেত্রেই নয় বরং সারা বিশ্বে দীর্ঘদিন পর্যন্ত বিশ্বের শ্রমিক ইতিহাসে, এমনকি মার্কসবাদী লেখকের কাছেও শ্রমিক শ্রেনির সঙ্গে পুরুষকে সমার্থক বলে ধরা হত। এমনকি সামান্য সংখ্যক বলে নারী ও শিশুদের আলাদা কোনও সমস্যা বা দাবি দাওয়া থাকতে পারে তাও ধর্তব্যের মধ্যেই আনা হয় নি। তবে সাম্প্রতিকালে নারী শ্রমিকদের ইতিহাস চর্চা বেশ গতি পেয়েছে। এক্ষেত্রে শমিতা সেন ও লিলা ফার্নান্ডেজ নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। ঐতিহাসিক অমল দাশের প্রবন্ধ 'বাংলার চটকল শ্রমিকদের চটকল বহির্ভূত জীবন (১৮৭০ থেকে ১৯২০)'তে চটকল জীবনযাপনের যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা মূলত এই পুরুষ শ্রমিকদের কেন্দ্র করে। অধ্যাপিকা মঞ্জু চট্টোপাধ্যায় তাঁর প্রবন্ধ 'চটকলের মেয়ে শ্রমিক-৭০ বছর আগে-পরে'তে মহিলা জুট শ্রমিকদের নিয়ে লেখা সত্যি প্রশংসনীয়। কিন্তু সামগ্রিক ক্ষেত্রে জুট মিলে কর্মরত নারী এদের রচনায় স্থান পেলেও, এক বিরাট অংশ নারী যারা চটকলের সাথে প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত নয় তারা ইতিহাসের মূল ধারায় স্থান পাই নি।

[সারনি-১]

বাংলার পাট শিল্পে নিযুক্ত মানুষের সংখ্যা, ১৯১২-১৯৪৪

বছর	কারখানা সংখ্যা	প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ সংখ্যা	প্রাপ্তবয়স্ক মহিলা সংখ্যা	শিশুশ্রমিকের সংখ্যা
১৯১২	৬১	১৪৫,৩৮৯	৩১,৩২৯	২৩,০০৭
১৯১৩	৬৪	১৫৮,২৬১	৩৪,০১০	২৪,১০৬
১৯১৪	৬৯	১৬৭,৮৫৮	৩৬,৮০০	২৫,৯০৯
১৯১৫	৭০	১৮১,৪৪৫	৪০,৬৭৪	২৬,৬৪৬
১৯১৬	৭০	১৯১,০৩৬	৪২,১৪৫	২৭,৬০৩
১৯১৭	৭১	১৯২,৬৬৭	৪১,৩৯৫	২৭,৩২০
১৯১৮	৭২	১৯৯,৯৭৭	৪৩,২৭৮	২৭,৭০৯
১৯১৯	৭২	২০১,০০৯	৪৩,১১২	২৮,৬২৮
১৯২০	৭৩	২০৭,২৫৫	৪৪,৫৪৫	২৮,৫২১
১৯২১	৭৭	২০৭,৯০৮	৪৪,৭০৫	২৯,২৩৫

*এম. ফিল গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯২২	৮০	২৩৯,৬৬০	৪৯,২৫৭	২৮,২৬৭
১৯২৩	৮৩	২৪২,৬৫২	৫১,৪৯৫	২৮,৪০০
১৯২৪	৮৫	২৫২,১০৭	৫৪,৮০১	২৭,৮২৩
১৯২৫	৮৩	২৫৬,৩১২	৫৫,৫১১	২৬,৪৭৪
১৯২৬	৮৬	২৫৩,৯৩৫	৫২,৮২৭	২০,৭৮৫
১৯২৭	৮৫	২৫৩,৬৮১	৫২,৯৩৫	১৯,২৪৯
১৯২৮	৮৬	২৬০,৩৪২	৫৩,৬৭৮	১৭,৮৭৯
১৯২৯	৯০	২৬৭,৭১৭	৫৪,৬৭০	১৭,২৭৮
১৯৩০	৯১	২৬৪,৪১৭	৫২,১১৪	১১,৬৪৬
১৯৩১	৯৩	২২২,৫৭৩	৪২,২৫৪	৩,৪৬২
১৯৩২	৯৪	২১২,৫০৫	৪০,২৯৪	১,৫১৫
১৯৩৩	৯২	২০৮,২৪৬	৩৭,৩৩৭	১,১৩৪
১৯৩৪	৯৩	২১৩,৮৯৪	৩৬,৯৩২	৯১৫
১৯৩৫	৯৫	২২৫,৩৭২	৩৭,৭৪৯	২৭৮
১৯৩৬	৯৪	২৩৩,৪৮১	৩৮,২৬১	৪
১৯৩৭	৯৬	২৪৯,৭৩৭	৩৭,৯৯৭	৯
১৯৩৮	৯৭	২৪২,৩৪২	৩৬,৬৮৩	৯
১৯৩৯	১০১	২৪৩,৪৯৬	৩৭,৬৯৯	৩৪
১৯৪০	১০১	২৪৮,০৪৬	৩৬,৬৪০	৩৪
১৯৪১	১০১	২৫১,৩৮৮	৩৫,২৫৫	৩৮
১৯৪২	১০১	২৫২,৭৯৯	৩৫,০৮৩	৩২
১৯৪৩	১০১	২৪৫,১২৫	৩৪,৭৫৯	৩৫
১৯৪৪	১০১	২৩১,১২১	৩৬,০০৫	৬৭

সূত্র: এস. আর. দেশপাণ্ডে, ভারতের চটশিল্পে শ্রমিকদের অবস্থা তদন্তের বিষয়ে রিপোর্ট(দিল্লি, ১৯৪৬), পৃষ্ঠা- ৬।

প্রথমেই কিছু কথা বলে রাখা দরকার। প্রথমত, এই চটকল শিল্পে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত নারী শ্রমিকের সংখ্যা পুরুষের অনুপাত ৫:১ হলেও, এই অনুপাতের বাইরেও অসংখ্য নারী পরোক্ষভাবে এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিল। বস্তুত বিংশ শতকের প্রথমার্ধ থেকেই এই জুট শ্রমিকদের চরিত্রগত পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে এবং এরা ক্রমে বাংলার স্থায়ী বাসিন্দায় পরিণত হতে শুরু করে, যার ফলে তাদের পরিবারও এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে এবং এরা এই শিল্পের অংশ হয়ে দাঁড়ায়।[৪] বস্তুত চটকল শিল্পে যুক্ত মহিলা শ্রমিকদের পাঁচভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যায়, এরা হল যথাক্রমে- ১. একক চটকল মহিলা শ্রমিক, ২. চটকল শ্রমিকের স্ত্রী, ৩. ক্রমে যে মহিলা শ্রমিক ও শ্রমিকের স্ত্রী, ৪. উপপত্নী বা রক্ষিতা, ৫. পেশাদার বেশ্যা (Prostitute)। দ্বিতীয়ত, আমাদের একথা মনে রাখতে হবে যে তৎকালীন সময় যে অভিবাসী এই জুট শিল্পে শ্রমিক রূপে যোগ দেয় তারা প্রত্যেকে ছিল নিরক্ষর। সুতরাং তাদের নিজস্ব সাহিত্য বলে কিছু নেই বললেই চলে। যদিও পরবর্তীকালে তাদের সন্তান-সন্ততিরা শিক্ষার আলো পাচ্ছে কিন্তু কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবের ফলে গ্রাম বাংলার নারীদের যে সৌভাগ্য হয়েছিল, সেই সৌভাগ্য বাংলার এই নিরক্ষর জুট মহিলা শ্রমিকদের ভাগ্যে জোটে নি। তৃতীয়ত, বাংলার যে কয়টি লেখক এই জুট শ্রমিকদের নিয়ে সাহিত্য রচনায় ব্রতী হন, যদিও তার সংখ্যা খুবই সামান্য, তাতেও এই নারী শ্রমিকরা তেমন জায়গা পাই নি। আর যদিও এক দুটি চরিত্র এই সাহিত্যগুলিতে উঠে এলেও তারা জুট শিল্পের সঙ্গে যুক্ত সামগ্রিক নারী শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করতে অপরাগ। চতুর্থ, একাধিক ঐতিহাসিকদের গবেষণায় এটা প্রমানিত যে এই অভিবাসী শ্রমিকগণ তাদের আত্মপরিচয় বাঁচিয়ে রাখার জন্য বিভিন্ন সংস্কার-নীতি, পুজা-আর্চনা করত। এবং আমাদের মনে রাখতে হবে যে এ সমস্ত পুজা-আর্চনা ও সংস্কার রক্ষার কাজে বাড়ির মহিলাই ছিল প্রধান। এসমস্ত বিষয় মাথায় রেখে আমরা আমাদের এই গবেষণাধর্মী প্রবন্ধটি এগিয়ে নিয়ে যাব।

আগেই বলা হয়েছে যে এই চটকলগুলিতে নিযুক্ত অবাঙালি শ্রমিকরা প্রায় সকলেই ছিল নিরক্ষর। সুতরাং তাদের নিজস্ব সাহিত্য বলে কিছু ছিল না বললেই চলে। তাই এই শ্রমিকদের বিশেষত নারী শ্রমিকদের চরিত্র, স্বভাব, সর্বোপরি জীবন যোঝার জন্য আমরা তৎকালীন কিছু বাংলা সাহিত্য এবং তার মধ্যে চিত্রিত চরিত্রের মাধ্যমে তৎকালীন সমাজে তাদের অবস্থাকে বোঝার চেষ্টা করব। এপ্রসঙ্গে প্রথমেই মনে পড়ে যায় প্রখ্যাত বাংলা কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম। বাংলার গ্রামীণ নারী সমাজের এক পূর্ণাঙ্গ চিত্র ফুটে ওঠে তাঁর লেখায়। যদিও চটকল জীবন সম্পর্কে তাঁর বিশেষ কোনও লেখা না থাকলেও, তাঁর লেখা এক ছোট গল্প 'মহেশ'এ এই চটকলগুলিতে শ্রমিক জীবন তথা নারী শ্রমিকের অবস্থা সম্পর্কে এক অস্পষ্ট ধারণা মেলে। উক্ত গল্পে গফুর যখন তার মেয়ে আমিনাকে গ্রাম ছেড়ে ফুলবেড়ের চটকলে যাওয়ার কথা বলে তখন তার মেয়ে অবাক হয়ে যায় এবং তার মনে পড়ে "ইতিপূর্বে অনেক দুখেও পিতা তাহার কলে কাজ করিতে রাজি হয় নাই;- সেখানে ধর্ম থাকে না, মেয়েদের ইজ্জত-আব্রু থাকে না, একথা সে বহুবার শুনিয়াছে"।[৫] তৎকালীন চটকল শিল্পে নারীদের অবস্থা এই ছোট এক বাক্য থেকে বোঝা যায়। মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের অসমাপ্ত চটাব্দতে লেখক জগদ্দলের চটকলের কালু সর্দারের কাহিনি বর্ণনা করেছেন। কাহিনিতে চটকলে কাজ করতে আসা মহিলাদের করুণ অবস্থার বিবরণ পাওয়া যায়। লেখকের ভাষায় 'কালু সর্দার একবার দেশ থেকে ফিরল, সঙ্গে তার এক দঙ্গল মেয়ে। দেশে কালুকে সবাই ডাকত 'দেওতা' বলে। সত্যি তাঁর ব্যবহার ছিল দেবতার মতো। মনে হত যেন পরের উপকার করবার জন্যেই সে জন্মগ্রহণ করেছে- নিজের বলতে তার কিছু নেই। সেই কালু সর্দার চটকলে ফিরে এসে ধরল আর এক মূর্তি। মেয়েগুলোকে রাখল সারি সারি কটা ঘরে প্রায় বন্দিনীর মতো। বলে দিল, তার হুকুম ছাড়া এক পা-ও তারা এদিক ওদিক যেতে পারবে না। মেয়েগুলো ভয়ে জড় সড়। কালু সর্দার সারাদিন মদ খেয়ে টং হয়ে ঘুরে বেড়ায়, চেঁচামেচি করে আর রাতে যখন যাকে খুশি ডেকে পাঠায় তার ঘরে। এমনই চললো কিছুদিন, তারপর শখ খানিকটা মিটলে কালু সর্দার তাদের একে একে কাজে লাগিয়ে দিল।"[৬]

বস্তুত অষ্টাদশ শতকের শেষ দশক থেকেই বিহার, উত্তরপ্রদেশ, উড়িষ্যা থেকে মূলত পতি-পরিত্যক্তা, বিধবা নারীরা একরকম বাধ্য হয়েই চটকলগুলিতে আসতে থাকে। এরাই বাংলার চটকলগুলিতে একক মহিলা শ্রমিক রূপে যোগ দেয়। এদের ঘর সংসার বলে কিছু ছিল না। এরা সমাজের চোখ রাঙানি না মেনে, নিজ স্বাধীন সত্ত্বার সন্ধানে ব্রতী হওয়ায়ে বাংলার সমাজে এরা হেয় বলে প্রতিপন্ন হয়েছে যার প্রতিফলন ঘটেছে একাধিক বাংলা সাহিত্যে। বাংলার উচ্চ সমাজের চোখে এরা পরিচিত হয়েছে 'মাগী' নামে। এরা সমাজের নিয়ম নীতির তোয়াক্কা করে নি। সমাজে পুরুষদের সমকক্ষতা দাবি করেছে। তাই তো মিল ও তার পার্শবর্তী অঞ্চলের মদের দোকানগুলিতে অনেক ক্ষেত্রে মহিলাদের বসার পৃথক ব্যবস্থা করা হত।[৭] এরা প্রচলিত অর্থে সংসারের কোনও কাজ করত না। সমরেশ বসুর একাধিক লেখায় চটকল জীবনের মর্মস্পর্শী চিত্র ফুটে উঠেছে। তাঁর লেখায় দু-একটি নারী চরিত্র ফুটে উঠলেও লেখাগুলি কিন্তু চটকল পুরুষ শ্রমিক কেন্দ্রিক যদিও তাঁর নারী চরিত্রগুলি তৎকালীন বাংলার চটকল নারী শ্রমিকদের চরিত্র অঙ্কনে সাহায্য করে। সমরেশ বসুর লেখা উপন্যাস 'বি. টি. রোডের ধারে'তেও চটকলে নিযুক্ত একক মহিলা শ্রমিকের চিত্র পাওয়া যায়। তাঁর উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র ফুলকি স্বভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী, সে নিজ সুখ সাচ্ছন্দ্যের জন্য অসৎ পথে যেতেও দ্বিধা করে না। সে পুরুষদের বাঁদি হয়ে থাকতে নারাজ। তাকে কেন্দ্র করে বস্তির পুরুষ শ্রমিকদের মধ্যে আবেগ লক্ষ্য করার মত।[৮] বস্তুত চটকলের এই একক মহিলা শ্রমিকদের মধ্যেই আমরা প্রথম চিরাচলিত সমাজের বাঁধন ভেঙ্গে নারীবাদী ভাবনার উন্মেষ দেখি, যদিও তার পেছনে লিঙ্গ সচেতনতা কতটুকু কাজ করে ছিল তা এক বিরাট প্রশ্ন।

১৮৯০ এর দশক থেকে বাংলার অভিবাসী শ্রমিকের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেলেও, শ্রমিকেরা কিন্তু সপরিবারে এই চটকলগুলিতে যোগ দিত না। তাদের পরিবার থাকত সেই গ্রামেই। ফলে চটকলে নারী — পুরুষদের আনুপাতিক হারে ব্যাপক পার্থক্য, পুরুষ শ্রমিকের প্রাধান্য, চটকল শ্রমিকদের স্বাভাবিক জীবনকে ব্যাহত করেছিল। অনেক সামাজিক অন্যায়, পাপ তাদের জীবনকে কলুষিত করেছিল। মদ্যপান, জুয়া খেলা ছাড়াও যৌন অপরাধের মাত্রা তাদের মধ্যে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। রয়েল কমিশন অন লেবার এর সামনে শিল্প শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে মতামত জানাতে গিয়ে স্বাস্থ্য বিভাগের সহকারী ডিরেক্টর ড. ব্যাটরা যে অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন তা থেকে যৌন অপরাধের মাত্রা যে বৃদ্ধি পাচ্ছিল তা জানা যায়। ড. কার্জেল ১৯১২-২২ সালে বাংলার ৭৬ টি চটকল পরিদর্শন করে যে প্রতিবেদন পেশ করেছিলেন তা থেকে জানা যায় যে সকল অভিবাসী শ্রমিক মাদ্রাজ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ থেকে বাংলার

চটকলে কাজ করতে এসেছিল তারা অধিকাংশই তাদের সঙ্গে স্ত্রীলোক নিয়ে এসেছিল। এই স্ত্রীলোকদের অনেকেই চটকলে কাজ করত। এই অভিবাসী শ্রমিকরা প্রতিদিন রাতে যাদের সঙ্গে সহবাস করত তারা কেহই তাদের স্ত্রী ছিল না।[৯]

বস্তুত উক্ত সময়পর্বে সপরিবারে বাংলায় বসবাস না করায় এদের সামাজিক জীবনে এক বিশৃঙ্খলা বিরাজ করত। উপপত্নী বা রক্ষিতা এই ধরনের বিশৃঙ্খলারই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। অনেক মহিলাই সমাজের কুনজর থেকে নিজেকে বাঁচাতে চটকল অঞ্চলের প্রভাবশালী কোনও ব্যক্তির রক্ষিতা বা উপপত্নী হওয়া শ্রেয় বলে মনে করত। অন্যদিকে পুরুষ শ্রমিক দীর্ঘদিন সপরিবার থেকে দূরে থাকায় এবং বাংলার বেঁচে থাকার তাগিদে উপপত্নীর প্রয়োজন বোধ করত। তবে উল্লেখ্য এই উপপত্নীরা তাদের স্বামীর গ্রামের সম্পত্তিতে কোনও অধিকার পেত না। এরা এদের শেষ জীবন পর্যন্ত এই পুরুষ শ্রমিকদের পত্নীর মর্যাদা পেত না।[১০]

বাংলা সাহিত্যেও এই ধরনের বিশৃঙ্খল জীবনের চিত্র সমরেশ বসুর রচনা থেকে পাওয়া যায়। তাঁর উপন্যাস 'বি. টি. রোডের ধারে'র অন্যতম চরিত্র লোটনের বউ এই ধরনের জীবনের জ্বলন্ত উদাহরণ। লোটনের মৃত্যুর পর এই অসহায় মহিলা এক প্রকার বাধ্য হয়েই লোটনের ছোট দুই ভাই এর রক্ষিতাতে পরিণত হয়।[১১] সমাজ লোটনের বউকে ভালো চোখে দেখে না। তার জীবন কোনও নরককুণ্ড থেকে কম ছিল না, তবু তাকে এই জীবন বেঁচে নিতে হয়েছিল, পরিস্থিতির চাপে। বাংলার চটকল সমাজের রক্ষিতাদের জীবন অত্যন্ত সহমর্মিতার সাথে তুলে ধরেছেন সমরেশ বসু তাঁর উপন্যাসে।

এই চটকল অঞ্চলগুলিতে প্রভাবশালী কিছু শ্রমিক তাদের জন্য রক্ষিতা বা উপপত্নী রাখতে সমর্থ হলেও, অধিকাংশ শ্রমিকের পক্ষে ইহা সম্ভব ছিল না। এই শ্রমিকরাও দীর্ঘদিন সপরিবার থেকে দূরে থাকায় এবং তাদের শারীরিক চাহিদা মেটানোর জন্য উক্ত অঞ্চলগুলিতে একাধিক বেশ্যালয় গড়ে উঠতে দেখা যায়। পেশাদার বেশ্যার সংখ্যা এপর্বে প্রচুর বৃদ্ধি পেয়েছিল। ড. কার্জেলের প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, তিনি ফোর্ট গ্লস্টারের গ্রামে বসবাসকারী বহু 'বেশ্যা' স্ত্রীলোক দেখেছিলেন।[১২] বস্তুত মিলের হাড়ভাঙ্গা খাটুনি, কম মজুরি, কাজের অনিশ্চয়তা, পুরুষ শ্রমিক তথা মালিকদের মিলিত অত্যাচার থেকে রেহাই বা বাঁচার বিকল্প ও সহজ পথ হিসেবে অনেক মহিলারাই পেশাদারী বেশ্যা বৃত্তি ধারন করে। ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে ক্ষেত্র সমীক্ষার দরুন জানা যায় সত্তরের দশক পর্যন্ত উক্ত অঞ্চলের বস্তি অঞ্চলগুলিতে বেশ্যালয় লক্ষ্য করা যেত।[১৩] সমরেশ বসুর রচনা থেকেও এই চটকল জীবনে বেশ্যা বৃত্তির এক মর্মস্পর্শী চিত্র পাওয়া যায়। তার 'বি. টি. রোডের ধারে' উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র ফুলকি যদিও মিলে কর্মরতা একজন মহিলা শ্রমিক, সে তার উচ্চাকাঙ্খা পূরণ ও বিলাসবহুল জীবনযাপনের জন্য সাহেবদের সাথে সহবাসেও কুণ্ঠা করে না। সুতরাং চটকল জীবনে বেশ্যা বৃত্তি এক সাধারন ঘটনায় পরিণত হতে থাকে।

উপরিক্ত বিষয় সমূহ কিন্তু তৎকালীন চটকল সমাজের একটি দিক মাত্র। বস্তুত চটকল সমাজে শুধুই বিশৃঙ্খল জীবন বিরাজ করত ভাবা ভুল। এর ঠিক উল্টো জীবনযাপনের চিত্রও পাওয়া যায়। ১৯২০ ও ৩০ এর দশক থেকেই বহু চটকল শ্রমিক সপরিবারে বাংলায় বসবাস করতে শুরু করে। ফলে এদের জীবনে ধীরে ধীরে স্থিরতা আসতে থাকে। গৃহস্থ জীবনে দুধরনের নারীর আমরা আগে উল্লেখ করেছি, এর হল যথাক্রমে- ১. চটকল শ্রমিকদের স্ত্রী, ২. ক্রমে যে মহিলা শ্রমিক ও শ্রমিকের স্ত্রী উভয় দায়িত্ব পালন করছেন। সুতরাং বিংশ শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশক থেকেই এই চটকল সমাজে ধীরে ধীরে পরিবর্তন সহজেই অনুধাবন করা যায়।

এই চটকল সমাজে গৃহস্থ জীবনে নারীর ভূমিকার এক অনন্য চিত্র এঁকেছেন সমরেশ বসু তাঁর রচনাগুলিতে। এক্ষেত্রে মনে পরে তাঁর উপন্যাস 'বি. টি. রোডের ধারে'র অন্যতম চরিত্র দুলারীর কথা। তবে উল্লেখ্য দুলারী চটকলের সঙ্গে যুক্ত প্রত্যক্ষ শ্রমিক না হলেও সে এই শিল্পে পরোক্ষভাবে যুক্ত নারীদের প্রতিভূ। এক্ষেত্রে গণেশ নামক শ্রমিকের জীবনে তার স্ত্রী দুলারীর গুরুত্ব অনুধাবনযোগ্য তার এই উক্তির দ্বারা- "কিন্তু দুলারী ও ভিনজাতের ছোট ঘরে মেয়ে। গাঁয়ে ওকে আমার ঘরে এনে তুললাম, তখন আমাদের ঘরের মানুষেরা আর ওদের জাতের লোকেরা আমাকে এমন পিটল যে, যান খতম মনে করে ফেলে দিয়েছিল নদীয়া কিনারে। তখন এই দুলারী আমাকে নিয়ে বনে জঙ্গলে লুকিয়ে ফিরেছে, সারা গায়ের খুন গাই বাছুরের মত চেটে চেটে তুলেছে, হাড়-গোড় ভাঙ্গা তুন্ডাকে কোলে করে রেখেছে। আর ও আজ মরতে বসেছে, এখানে আমি কার উপরে শোধ তুলব। কার উপর? তাই ভেবেছিলাম আমিও মরব...মরব ওর সঙ্গে।"[১৪] এই ছোট এক বাক্য চটকল শ্রমিক পরিবারের অভ্যন্তরে নারীদের গুরুত্বকে বুঝতে সাহায্য করে। গণেশের জীবনে বাঁচার একমাত্র সম্বল হচ্ছে তার স্ত্রী দুলারী, সে বেঁচে না

থাকলে তার জীবনও মুল্যহীন, এমনকি তার না বাঁচাই শ্রেয় বলে গণেশ মনে করে। এই রকম হাজার হাজার দুলারী যে গণেশের মত শ্রমিকদের জীবনে বাঁচার শেষ বল ছিল তা বলাই বাহুল্য।

সুতরাং চটকল সমাজে এক সুস্থ স্বাভাবিক জীবন বজায় ছিল তা সহজেই অনুমেয়। তবে এই সব মহিলাদের সংসারের যাঁতাকলে নিদারুন শোষণের সম্মুখীন হতে হত। মিলের কম আয়ের মধ্যে এদের সংসার চালাতে হত। অনেক সময় এদের বিকল্প উপার্জনের পথে হাঁটতে হত। সংসারের অভ্যন্তরে পুরুষদের নানান অত্যাচার এদের সহ্য করতে হত। সারাদিন সংসারের কাজ ও নিজেদের সন্তানদের যাবতীয় দায়িত্ব এদের পালন করতে হত। নিদারুন কষ্টের মধ্যে দিয়ে এদের জীবন অতিবাহিত হত।

সংসারের অভাব অনটন থেকে মুক্তির আশায় অনেক মহিলারাই জুট মিলগুলিতে কাজে যোগ দেয়। এরা একাধারে সংসারের কর্ম সম্পন্ন করে, মিলের কাজে যোগ দিতে হত ফলে এদের ওপর শোষণ ছিল দ্বিমুখী, একদিকে মিল মালিকরা কম মজুরিতে এসমস্ত শ্রমিকদের কাজে নিযুক্ত করত, অন্যদিকে সংসারের যাবতীয় দায়িত্বও এদের বহন করতে হত। ফলে জীবন ছিল আরও ভয়ঙ্কর। এক্ষেত্রে সমরেশ বসুর উপন্যাস 'যুগ যুগ জিয়ে'র অন্যতম চরিত্র মঙ্গলির কথা মনে পড়ে। সে শুধু গৃহস্থ কর্ম সম্পন্ন করে তাই নয়, সে একজন প্রত্যক্ষ জুট শ্রমিকও। এই সমস্ত মহিলাদের মিলের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে দীর্ঘ ১০-১২ ঘণ্টা কাজ করার পর আবার সংসারের যাঁতাকলে নিদারুন শোষণের সম্মুখীন হতে হত।[১৫]

তবে সামগ্রিক ভাবে এই চটকল অঞ্চলগুলিতে মহিলা শ্রমিকদের অবস্থা ছিল খুবি খারাব। মহিলাদের আর্থিক অবস্থা একেবারেই ভালো ছিল না। তাঁরা যে সামান্য মজুরি পেতেন, তাতে তাদের সংসার চলত না। তাঁরা অত্যন্ত সাধারন মানের খাবার পেতেন, মহিলারা তাদের সাজ-গোজ বা পোশাক পরিচ্ছদের পেছনে খুব একটা খরচ করতেন না। ১৯৩১ আর রয়েল কমিশনের নিজস্ব তদন্ত রিপোর্টে শ্রমিকদের করুণ অবস্থার কথা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। তাতে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার অদক্ষ পুরুষ শ্রমিকদের দৈনিক বেতন ৮ আনা, নারীদের ৫ আনা এবং বালক-বালিকাদের ৪ আনারও কম ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[১৬] সুতরাং উক্ত পর্বে এই মহিলা শ্রমিকরা বৈষম্যের স্বীকার ছিলেন তা সহজেই বলা যায়।

মহিলা শ্রমিকদের কর্মস্থল ও বাসস্থানের পরিবেশ অত্যন্ত খারাপ ও অস্বাস্থ্যকর ছিল। দীর্ঘ সময় ধরে কারখানায় কাজ করতে করতে তারা প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়তেন। ঘিঞ্জি পরিবেশে আলো বাতাসহীন বদ্ধ ঘরে আবদ্ধ থেকে তারা নানান রোগে আক্রান্ত হত। তাদের চিকিৎসার জন্য কোনও সুব্যবস্থা ছিল না। দীর্ঘ সময় কারখানায় কাজ করার দরুন তাদের নিজ বাসস্থান তাদের জন্য Sleeping quarters' এ পরিণত হত। তাদের বাসস্থান অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর, ঘিঞ্জি এবং নোংরা ছিল। একটি ছোট ঘরে ৫-৬ জন লোক কোনও ক্রমে বসবাস করত। বস্তিগুলিতে শৌচাগারের ব্যবস্থা ছিল শোচনীয় ও ভয়াবহ। ছিল না পানীয় জলের সুব্যবস্থা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রকৃতির মুক্ত জায়গায় তাদের মল, মুত্র ত্যাগ করতে হত। মহিলাদের কোনও রকমের প্রাইভেসি বা গোপনীয়তা ছিল না।[১৭]

একদিকে অমানুষিক পরিশ্রম এবং অপর দিকে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাসের ফলে মহিলাদের স্বাস্থ্য অকালে ভেঙ্গে পড়ত। অধিকাংশ মহিলারাই অপুষ্টিজনিত রোগে এবং রক্ত অল্পতায় ভুগতেন। নোংরা জল ব্যবহারের ফলে মহিলা ও শিশুদের মধ্যে কলেরা, টাইফয়েড বা পেটের রোগ বৃদ্ধি পায়। চিকিৎসার সুব্যবস্থা না থাকায় অকালেই এদের মরতে হত। চটকল মহিলা শ্রমিকরা, বিশেষ করে যারা পাট বাছাই ও গোছানোর কাজে লিপ্ত ছিলেন তারা একধরনের চর্ম রোগের শিকার হতেন যা 'Jute dermatitis' নামে পরিচিত। আবার মহিলা শ্রমিকদের মধ্যে অনেকেই বিশেষ করে হিন্দু মহিলারা সাবানের পরিবর্তে 'সাজি মাটি' (Saji mati) ব্যবহার করার কারনে নানাবিধ চর্ম রোগের শিকার হতেন।[১৮]

পরিশেষে বলা যায়, বাংলা সাহিত্যে বাংলার জুট মহিলা শ্রমিকেরা তেমন গুরুত্ব না পেলেও, বাংলার জুট মিলকেন্দ্রিক সমাজে এদের অবস্থান ছিল স্বাতন্ত্র ও গুরুত্বপূর্ণ। আরও স্পষ্ট ভাবে বলতে গেলে এই সমাজের মেরুদণ্ড ছিল এই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে জুট শিল্পে যুক্ত মহিলা শ্রমিকরা, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যখন বাংলায় জুট মিলগুলো গড়ে ওঠে, তখন বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল থেকে পুরুষ শ্রমিকের পাশাপাশি মহিলা শ্রমিকও এই মিলগুলোতে শ্রম শক্তি যোগান দিতে এগিয়ে আসে। এই মিলগুলোতে প্রাথমিক পর্যায় মহিলা শ্রমিকদের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায় মিলের অভ্যন্তরে 'মাগিকল' নামক পৃথক এক ডিপার্টমেন্টের নাম থেকে। সর্দারদের হাত ধরেই এই নারী শ্রমিকদের বাংলায় আগমন এবং তাদের ওপর অকথ্য অত্যচারের সম্পর্কে আমরা আগেই অমল

দাশের প্রবন্ধ হতে অবগত হয়েছি। আগেই বলেছি এই অত্যাচারই তাদের জীবনে শেষ কথা ছিল না, বাংলার চটকল সমাজে আমূল পরিবর্তনের মূলে প্রধান চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করেছিল এই নারীরা। চটকল শ্রমিকদের 'Dual Character' অর্থাৎ অর্ধ কৃষক — অর্ধ শ্রমিক চরিত্রের অবসান ঘটে মূলত তখন যবে থেকে এই শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকেরা সপরিবারে বাংলায় থাকতে শুরু করে। ধীরে ধীরে চটকল শ্রমিকরা মিল কোয়ার্টার্স থেকে বেড়িয়ে পার্শবর্তী অঞ্চলে ছোট ছোট বস্তি গড়ে তুলতে থেকে। পরবর্তী কালে এই বস্তিগুলি নগরের চরিত্র ধারন করে। এই বস্তিগুলিতে এক মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে ওঠে মূলত এই নারীদেরকে কেন্দ্র করেই। সুতরাং এই চটকল জীবনে নারীদের ভূমিকা কোনও অংশেই পুরুষদের তুলনায় কম ছিল না।

সূত্রনির্দেশ :-

১. W. K. Firminger, Thacker's Guide to Calcutta (Calcutta, 1906), Page-237.
২. বি. ফলি : রিপোর্ট অন লেবার ইন বেঙ্গল, ১৯০৬।
৩. S. R, Deshpande, Report on an Enquiry into Conditions of Labour in the Jute Mill Industry in India (Delhi, 1946), Page-6.
৪. Dipesh Chakrabarty, Rethinking Working Class History: Bengal 1890 to 1940 (Princeton, 1989).
৫. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'মহেশ', সুলভ শরৎ সমগ্র ২, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা- ১৭২৮-৩২।
৬. মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, অসমাপ্ত চটাব্দ, কলকাতা, ১৯৬৩, পৃষ্ঠা- ৯৬-১০০।
৭. অমল দাশ, বাংলার চটকল শ্রমিকদের চটকল বহির্ভূত জীবন (১৮৭০ এর দশক থেকে ১৯২০-র দশক), অনুসন্ধানে শ্রমিক ইতিহাস, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ২০১৩, পৃষ্ঠা- ১১৫।
৮. সমরেশ বসু, বি. টি. রোডের ধারে, ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস লিমিটেড, ১৯৫৩, পৃষ্ঠা- ২৬-২৭।
৯. অমল দাশ, তদেব, পৃষ্ঠা- ১১৫-১১৬।
১০. ক্ষেত্রসমীক্ষা, তারিখ- ০৫/০৪/১৭।
১১. সমরেশ বসু, তদেব, পৃষ্ঠা- ১৭।
১২. কমার্স ডিপার্টমেন্ট, কমার্স ব্রাঞ্চ, নং বি ৭৭, এপ্রিল ১৯২৩।
১৩. ক্ষেত্রসমীক্ষা, তারিখ- ০৫/০৪/১৭।
১৪. সমরেশ বসু, তদেব, পৃষ্ঠা- ৮৪।
১৫. তদেব, যুগ যুগ জীয়ে, আনন্দ পাবলিশের অ্যান্ড লোকভারতি, ১৯৯০, পৃষ্ঠা- ২৮৫-২৯৫।
১৬. Report of the Royal Commission on Labour in India (Whitley Commission), London, 1931.
১৭. অমল দাশ; ভারতের ইতিহাসে নিম্নবর্গের নারী শ্রমিক : এদের সংকট ও সংগ্রাম, উনিশ থেকে বিশ শতক, প্রগতিশীল প্রকাশক, ২০১৩, পৃষ্ঠা- ৭৫-৭৬।
১৮. তদেব, পৃষ্ঠা- ৭৬।